নিঃসঙ্গ এক কর্নেল যেখানে গিয়ে পৌঁছোন

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

বিদ্রোহী লিবারেল সৈনিকদের নেতা কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়া অস্ত্র সমর্পণ-চুক্তির শেষ কাগজটিতে সই করেছেন যখন, তাঁবুর প্রবেশপথে তখন দেখা দিলেন অল্পবয়সি এক বিদ্রোহী কর্নেল, সঙ্গে একটি অশ্বতর, তার পিঠে দুটি বড়ো বাক্স। দৃষ্টি শুষ্ক, স্থৈর্যের ভাব। মাকোন্দো-অঞ্চলে বিদ্রোহীদের কোষরক্ষক ছিলেন তিনি। সময়মতো পৌঁছোবার জন্য ছ-দিনের অত্যন্ত কষ্টকর এক পথ ভ্রমণ করতে হয়েছে তাঁকে, তাঁর অশ্বতরটি ক্ষুধায় মৃতপ্রায় তখন। বাক্সদুটি নামিয়ে তিনি বের করলেন বাহাত্তরটি সোনার ইট, আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় যে - ধনভাণ্ডারের কথা ভুলে গিয়েছিলেন সবাই, তারপর একটি একটি করে রাখলেন টেবিলে। কর্ণেল বুয়েন্দিয়া সেগুলো যুক্ত করে নিলেন সমর্পণ- তালিকায়। কৈশোর - উত্তীর্ণ সেই কর্নেল দাঁড়িয়ে আছেন দেখে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি: 'আর কিছু'? 'রসিদ', উত্তর করলেন তরুণ কর্ণেল। রসিদ লিখে দিলেন কর্নেল বুয়েন্দিয়া।

কথা ছিল যোদ্ধারা সবাই পেনশন পাবেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ঘোষণা করলেন রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট, লিবারেল বা কনসার্ভেটিভ, প্রাক্তন কোনো যোদ্ধাই পেনশন পাবেন না যতদিন-না একটি বিশেষ কমিশন প্রতিটি কেস বিচার করছে এবং পেনশন দেবার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করছে কংগ্রেস। ঘোষণা শুনে গর্জন করে উঠলেন কর্নেল বুয়েন্দিয়া, 'এ তো জঘন্য অন্যায়! লোকগুলো ডাকের অপেক্ষায় থেকে থেকে বুড়ো হয়ে গিয়ে মরে যাবে।'

'ওয়াল হানড্রেড ইয়ার্স অব সলিটিউড' - এর কথা এসব। তার আগে লেখা হয়ে গেছে 'নো ওয়ান রাইট্স টু দা কর্নেল।' যে কর্নেলকে নিয়ে লেখা সে-উপন্যাস তিনিই তরুণ বয়সে বিপ্লবীদের ধনভান্ডার নিয়ে গিয়েছিলেন নিরল্যান্ডিয়ায়, একটি শিমুলগাছের তলায় আত্মসমর্পণ - চুক্তির অনুষ্ঠানে। প্রায় ষাট বছর হয়ে গেছে শেষ গৃহযুদ্ধের পর, তবু পেনশনের চিঠি আসেনি তাঁর কাছে। এতনিদ শুধু অপেক্ষাই করেছেন তিনি, আর কিছু করেননি।

দুই

কলম্বিয়ায় উপকূল - অঞ্চলের ছোট একটি শহরে বিন্যস্ত 'নো ওয়ান রাইট্স টু দা কর্নেল' উপন্যাসটি। ট্রেন নেই, কলার গন্ধ নেই, আছে একটা নদী; লঞ্চে যেতে হয় সেখানে। সামরিক আইন জারি আছে তখন, সহচর হিসেবে আচে সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ। প্রতিদিন রাত এগারোটায় বাজে কারফিউর সংকেত। সব - দিকে নজর থাকে সরকারের, এমনকী অন্ত্যেষ্টিযাত্রীরা পুলিশ ব্যারাকের সামনে দিয়ে যেতে গেলে আপত্তি করেন শহরের মেয়র। বিদ্রোহের আশঙ্কা তাড়িয়ে বেড়ায় সরকারকে, তাই পুলিশহানাও চলে এখানে - ওখানে, বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলেই। প্রতিরোধ - যুদ্ধ তবু হয়, দেশের অভ্যন্তরে দূরবর্তী কোনো কোনো জায়গায়; বিদ্রোহের সমাচার নিয়ে গুপ্তপত্রপত্রিকাও আসে শহরে, বিলি হয় গোপনে গোপনে।

এর সঙ্গে নৈতিক দিকে কাজ করে চার্চের অনুশাসন। যে-ফিল্ম দেখানো হবে শহরের থিয়েটারে সেটা কাদের দেখার যোগ্য তা জানিয়ে দেওয়া হয় গম্বুজের ঘন্টা বাজিয়ে। যদি বারোবার ঘন্টাধ্বনি হয় তবে কারোই দেখা উচিত নয় বিশেষ ফিল্মটি। প্রতিমাসে সেন্সরের পাঠানো গুণমান - সংক্রান্ত নির্দেশের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা চালু করেছেন চার্চের ফাদার। শুধু তাই নয়, নিজের অফিসের দরজায় বসে হলের প্রবেশপথের দিকে তাকিয়ে থেকে লক্ষ্য রাখেন ফাদার, বারোটা ঘন্টাধ্বনি সত্ত্বেও কারা যাচ্ছে ফিল্মটি দেখতে।

ছোটো শহরটির এই পরিমন্ডলে বেঁচে আছেন কর্নেল। চেহারায় কাঠিন্য, মজবুত সব হাড় যেন নাট - বোলটু দিয়ে জোড়া, চোখে জীবনীশক্তির দ্যুতি।

শহরের প্রান্তে তাঁর বাড়ি — তালপাতায় - ছাওয়া ছাদ, চুনের - প্রলেপ- খসে - পড়া দেওয়াল। অর্থাভাব, তাই মর্টগেজ রাখা হয়েছে বাড়িটা।

তিন

আখ্যানের শুরু এক অক্টোবর মাসের কোনো - এক সকালে। শেষ গৃহযুদ্ধের পর সামান্য যে-কটি জিনিস এসেছে কর্নেলের জীবনে তার মধ্যে একটি হলো অক্টোবর মাস, যখন শীত পড়ে, বৃষ্টি হয় দিনের পর দিন, কখনো কখনো বজ্রবিদ্যুৎ-সহ আছড়ে পড়ে ঝড়, আর অম্ত্রে সমস্যা হয় তাঁর, কোষ্ঠবদ্ধতায় কষ্ট পান তিনি।

স্ত্রী হাঁপানিরোগী। হাঁপানির আক্রমণ হলে খিলানের মতো বাঁকা শক্ত মেরুদন্ডের উপর একটুকরো শাদা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তাঁকে। অন্য সময়ে অবশ্য ঘরের কাজকর্মে মেতে থাকেন তিনি।

আখ্যানের শুরু যে অক্টোবরে তার ন-মাস আগে গুলি করে খুন করা হয় তাঁদের ছেলে অগাস্টিনকে, যখন সে গুপ্তপত্র বিলি করছিল মোরগ-লড়াইয়ের জায়গায়। এখন ছেলের লড়ুয়ে মোরগটির দেখভাল করছেন কর্নেল। আসছে জানুয়ারিতে লড়াই, তাই নজর রাখতে হচ্ছে যাতে দুর্বল না হয়ে পড়ে মোরগটি। কিন্তু অর্থ আসবে কোথা থেকে? অগাস্টিনের সেলাইমেশিন বিক্রি করে যে- অর্থ পেয়েছিলেন তাঁরা, তার প্রতিটি মুদ্রা টিপে টিপে খরচ করে চালিয়েছেন ন-মাস এখন পড়ে আছে দুটি কুড়ি সেন্টের আর একটি দশ সেন্টের মুদ্রা।

ওদিকে পেনশনের কোনো খবর নেই। শুক্রবারের পর শুক্রবার কর্নেল যান লঞ্চঘাটায়, তাকিয়ে থাকেন ডাকের লঞ্চের দিকে, লক্ষ করেন কখন পোস্টমাস্টার মেলব্যাগ নিয়ে ফিরছেন অফিসে। কিন্তু পেনশনের চিঠি আসে না। 'কর্নেলের জন্য কিছু নেই', 'কর্নেলকে লেখে না কেউ', এ-রকম উত্তর পান পোস্টমাস্টারের কাছ থেকে।

উনিশ বছর আগে কংগ্রেস আইন পাশ করবার পর তাঁর আটবছর লেগেছিল দাবির ন্যায্যতা প্রমাণ করতে, তারপর ছ-বছর লেগেছিল নাম নথিভূক্ত করাতে। সেই ছিল শেষ চিঠি। কর্নেল সিদ্ধান্ত করেন উকিল পালটাবেন। উকিল পালটাবার পর একমাস হয়ে গেলে আবার যান পোস্ট অফিসে, এবার পোস্টমাস্টারের উত্তর, 'কর্ণেল, যা নিশ্চিত আছে তা হলো মৃত্যু।'

চার

সুদীর্ঘ এই প্রতীক্ষা অনুভবে অনেক কিছু জানবার বুঝবার ক্ষমতা তীক্ষ্ণ করেছে কর্নেলের, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র করেছে তাঁর দুশ্চিন্তাও। মাঝে মাঝেই হাঁপানির আক্রমণে বিছানায় মিশে থাকেন স্ত্রী, তাঁর অস্তিত্ব আছে কি নেই বোঝা যায় না তখন। তার উপর আছে মোরগটির পরিচর্যা। একই সঙ্গে নিজেদের আর মোরগের প্রয়োজন মেটানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে দিন-দিন। তার নিজের শরীরও ভালো যাচ্ছে না, অস্থিচর্মসার হয়ে পড়েছেন তিনি।

এই অবস্থায় স্ত্রী বলেন মোরগটাকে বিদায় করে দিতে, কিন্তু কর্ণেল চান না, কেননা লড়াইয়ের পর বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যাবে। অগাস্টিনের কথা ভেবেও রেখে দেওয়া উচিত মোরগটা, কর্ণেলের এ যুক্তিও টেকে না স্ত্রীর কাছে। তিনি চিৎকার করে বলে উঠেন: 'অভিশপ্ত মোরগগুলোই ওর মৃত্যুর কারণ। জানুয়ারির ৩ তারিখে যদি ও থাকত বাড়িতে, তাহলে আসত না ওর সর্বনাশের মুহূর্ত।' আসলে, নিজের মুখের গ্রাস মোরগকে দিতে হচ্ছে বসে শঙ্কিত তিনি। একটাই প্রশ্ন তাঁর : কী খাবেন তারা? এর উত্তর জানেন না কর্নেল কিন্তু মনে করেন খাবারের অভাবে যদি মরেই যাবেন তাঁরা, তবে তো এত-দিন মরে যাবার কথা তাঁদের।

এ-ও তো ঠিক যে অর্থের সংস্থান করতেই হবে তাঁদের। বাড়িতে বিক্রি করবার মতো জিনিস আছে মাত্র দুটো : কাঠের কেসের পেন্ডুলাম - ঘড়ি আর গোলাপফুল - ভরা নৌকোয় কিউপিড - পরিবেষ্টিত ফিনফিনে সিল্কের পোশাক- পরা এক নারীর ছবি। মুশকিল হলো, নিজের অবস্থার কথা কাউকে খোলাখুলি বলা তো দূরের কথা, ঘরের জিনিস কারো কাছে বিক্রি করবার প্রস্তাব দেওয়াও দুষ্কর কর্নেলের পক্ষে। যাদের সঙ্গে মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতা তাঁর তাদের কারো কাছেই নিজেকে পুরোপুরি খুলে দিতে পারে না কর্নেল। ফি না নিয়ে স্ত্রীর চিকিৎসা করেন যে যুবক তাঁর কাছে না, এমনকী অগাস্টিনের দরজির দোকানের বন্ধুদের কাছেও না, যদিও সবাই তাঁর দরদি এবং রাজনৈতিক স্পন্দনেও কাছের মানুষ। ফলে ঘড়িটা যখন নিয়ে যান দরজি আলবারোর কাছে, বলতে পারেন না সেটা বিক্রি করতে চান। সেদিনই মোরগটা যখন দিয়ে দিতে চান দোকানের ছেলেদের, আর্থিক অসংগতির কথা না বলে বয়সের দোহাই দেন। 'এতটাই বয়স আমার যে ওর দেখভাল আর করতে পারছি না', বলেন তিনি। কর্নেলের সঙ্গে কথা বলে দোকানের হার্নান বুঝতে পারে সমস্যাটা। তার প্রস্তাবমতো দোকানের ছেলেরা দায়িত্ব নেয় মোরগটির খাবারের।

তখন এমনই অবস্থা তাঁদের যে, ছেলেরা যে - পরিমাণ জনার দিয়ে যায় মোরগটির জন্য তার থেকে কিছুটা নিয়ে নিজেদের জন্য ডাউ বানান কর্নেলের স্ত্রী। কিন্তু এভাবে কি চলতে পারে সংসার?

অনেক চেষ্টা করেও ঘড়ি আর ছবি বিক্রি করতে পারেন না কর্নেলের স্ত্রী। বিয়ের আংটি বন্দক রেখে ফাদারের কাছে থেকে টাকা আনবারও চেষ্টা করেন, কিন্তু ফাদার বলেন পবিত্র জিনিস বিনিময় করা পাপ। শুনে অসন্তুষ্ট হন কর্নেল। কেননা এর ফলে লোকে জেনে যাচ্ছে তাঁরা অনশন করছেন। তাঁর মনে হয়, চল্লিশ বছর একসঙ্গে দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে এসেও স্ত্রীকে ঠিক চেনা হলো না তাঁর। তাঁদের ভালোবাসাও পুরোনো হয়ে গেছে অনুভব করেন তিনি। ক্রুদ্ধ স্ত্রী জানিয়ে দেন : 'এই সংসারে কৃত্রিমতা আর ভান আমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত', 'অসহ্য এই হালছাড়া ভাব আর মর্যাদাবোধ।' সম্বলহীন সংসারের দূরত্ব তৈরি হতে থাকে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে।

পাঁচ

স্ত্রীর অনুযোগ আর গঞ্জনার সেই রাতে কর্নেল তলিয়ে যান চিন্তায়, মনে আসে পুরোনো দিনের কথা। নিরল্যান্ডিয়া-চুক্তির পর দশবছর তিনি অপেক্ষা করেছিলেন মাকোন্দো-য়, তারপর চলে আসেন কলার চাষ আর ব্যাবসার ধুম ('ব্যানানা ফিভার') লাগে যখন। কলার গন্ধ সহ্য হয়নি তাঁর। সেই থেকে পঞ্চাশ বছর লেগেছে তাঁর এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে যে, নিরল্যান্ডিয়ায় আত্মসমর্পণের পর মুহূর্তের শান্তিও পাননি তিনি।

কর্নেল ঠিক করেন মোরগটা বিক্রি করে দেবেন এবার। সেজন্য যাবেন তাঁর অবস্থাপন্ন বন্ধু সাবাসের কাছে। অগাস্টিনের ধর্মপিতা তিনি, কর্নেলের পার্টির একমাত্র নেতা যিনি রাজনৈতিক নির্যাতন এড়িয়ে থেকে যেতে পেরেছেন শহরে। মোরগটা বিক্রি করলে ন-শো পেসো পাওয়া যাবে, একদিন বলেও-ছিলেন তিনি।

স্ত্রীকে কর্নেল জানিয়ে দেন তাঁর সিদ্ধান্ত। দ্বিধা অবশ্য থেকেই যায় তাঁর। তবু অবস্থার চাপে তিনি বাধ্য হন

বন্ধুর কাছে যেতে। কিন্তু ন-শো পেসো নাকি পাওয়া যাবে না এখন। দিনকাল যা পড়েছে তাতে ভালো মোরগ নাকি কেউ নিয়ে যেতে চায় না লড়াইয়ে, পাছে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় অঙ্গনে। বেশি দাম দিয়ে তাই মোরগ কিনতে চায় না কেউ। চারশো পেসোয় নাকি কিনতে পারে একজন; তাতেই রাজি হয়ে যান কর্নেল। ষাট পেসো অগ্রিম পান বন্ধুর কাছ থেকে, বাকিটা পাবেন বিক্রির পর।

স্ত্রীর চিকিৎসকের ধারণা অবশ্য এই যে, মোরগটা ন-শো পেসোতেই বিক্রি করবেন কর্নেলের বন্ধু। যে-লোক মেয়রের সঙ্গে বোঝাপড়া করে থেকে যেতে পারে শহরে আর বিতাড়িত সহযোদ্ধাদের সম্পত্তি কিনে নিতে পারে অর্ধেক দামে তার পক্ষে তো সেটা করাই স্বাভাবিক। প্রথমে বিশ্বাস না করলেও ডাক্তারের কথাগুলো ভাবায় কর্নেলকে।

ছয়

কর্নেলের হতাশা আর নিঃসঙ্গতার এ-গল্প একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়ায় এর পর।

ডিসেম্বর মাস এসে গেছে তখন, অক্টোবর-নভেম্বরে যে শারীরিক কষ্ট ছিল তাঁর আর নেই। এক শুক্রবার বিকেলে চিঠি আসবে আশা করে লঞ্চঘাটার দিকে যান তিনি। একসময় পোস্টমাস্টারকে অনুসরণ করতে করতে যাচ্ছেন যখন, তখন মোরগ-লড়াইয়ের জায়গায় হইচই শুনে অবাক হয়ে যান তিনি। পথ-চলতি কেউ তাঁর মোরগের কথা বলে যায়, তখন মনে পড়ে ট্রায়ালের দিন সেটা।

কর্নেল চলে আলেন কোলাহলের আবহে, দেখেন লড়াই - অঙ্গনের মাঝখানে রয়েছে তাঁর মোরগ — একা, অসহায়, স্পার (লড়াইয়ের জন্য পায়ে বেঁধে দেওয়া ছুরি) কাপড়ের টুকরো দিয়ে জড়ানো, পায়ের কম্পনে ভয়ের ভাব। পরে অবশ্য থাকে না ভয়ের ভাবটা। কিন্তু আক্রমণ করছে না সে, আক্রমণ ঠেকাচ্ছে, তারপর থেকে যাচ্ছে একই জায়গায়।

দরজির দোকানের হার্নান্ বেড়া টপকে গিয়ে মোরগটাকে তুলে নিয়ে দেখায় দর্শকদের, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় একদফা উল্লাস আর বাহবাধ্বনি। কর্নেল লক্ষ করেন যতটা-না তীব্র তার লড়াইয়ের তার চেয়ে বেশি উৎসাহ লোকজনের। তার মনে হয় এটা একটা প্রহসন যাতে মোরগদুটোও জড়িয়েছে নিজেদের, স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে। কিছুটা অবজ্ঞা নিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করেন লড়াইয়ের অঙ্গনটাকে, তারপর তাকান নেমে আসা জনস্রোতের দিকে। লোকজন সব নতুন, শহরের নতুন লোকজন ভিড় জমিয়েছে এখানে। তখন স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়া একটি মুহূর্ত পুনর্যাপন করেন তিনি, পূর্বাভাস - সহ। কর্নেল হার্নানের হাত থেকে নিয়ে নেন মোরগটাকে, 'গুড আফটারনুন' -পর্বের পর আর কিছু বলেন না, কেননা মোরগের উষ্ণ গভীর স্পন্দন কাঁপিয়ে দেয় তাকে। এমন জীবন্ত জিনিস আগে কখনো হাতে নেননি তিনি, মনে হয় তাঁর।

এইসব পর্যবেক্ষণ, এইসব ছবি শুধুশুধু আসে না উপন্যাসে। মোরগটির লড়াই-প্রাঙ্গণের ছবির সঙ্গে, তাঁর উষ্ণ গভীর স্পন্দনের সঙ্গে কর্নেলের যোগ বুঝে নেওয়া যায় সহজেই। কিন্তু কেন আসে অন্যসব পর্যবেক্ষণ, অন্যসব ছবি? জনতার উল্লাসে কেন হয় স্মৃতির উদ্বোধন? এ-সবের ফলে কি তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক - সামাজিক ঘটনাবলির কথা? নাহলে কেন মনে আসে পুরোনো দিনের একটি অনুষ্ঠানের ছবি? সে ছিল আরেক যুদ্ধের ব্যাপার। বৃষ্টির মধ্যেও চলছে অনুষ্ঠান, তাঁদের - অঙ্গনে নিখুঁত সজ্জায় হাজির পার্টিনেতারা বাজনার তালে তালে হাওয়া করছে নিজেদের, কর্নেল স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে ছাতার তলায়। গমগমে ড্রামের অনুনাদ এখনও যেন বেদনার অনুভূতি জায়গা তাঁর অন্ত্রে। সেদিনও লড়াই ঘিরে ছিল প্রাণকোলাহল, তারপর দীর্ঘ অসাড়তার পর চিঠিহীন আরেকটি শুক্রবারের বিকেলে যেন জেগে উঠেছে ধ্বস্ত শহর। ফিরে আসতে আসতে কর্নেল দেখেন, যেকানে মালপত্র নামাচ্ছে সাকাঁসের দল সেখানেও অনেকদিন আগেকার নির্বাচন-দিনের মতো লোকজনের ভিড়।

আত্মনিমগ্ন কর্নেল ফিরে আসেন লড়াই - প্রাঙ্গনের বাহবাধ্বনির রেশ কানে নিয়ে। স্ত্রীকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিক্রি করবেন না মোরগটাকে। তাঁর সমস্ত কথায় তখন দৃঢ়তার ছোঁয়া। বিক্রির ব্যাপারে দ্বিধা তাঁর ছিলই, বিকেলের ওইসব ছবি আর ঘটনা যেন দৃঢ় করে দিয়ে যায় তাঁর অবস্থানকে। বাড়িতে শুরু হয়ে যায় অশান্তি।

সাত

কর্নেলের স্ত্রীরও গল্প আছে একটা। সারাজীবন কষ্ট করেছেন, মুহূর্তের স্বস্তি মেলেনি, এখন ধীরে দীরে এগিয়ে যাচ্ছেন মৃত্যুর দিকে। স্বামীর কাছে একটা মোরগেরও মূল্য বেশি তাঁর চেয়ে, অভিযোগ তাঁর। আর কর্নেল বলেন : 'ডাক্তার যদি গ্যারান্টি দেয় মোরগটা বিক্রি করলে তোমার হাঁপানি সেরে যাবে তাহলে এক্ষুনি আমি বিদায় করে দেব ওটাকে।'

অশান্তি চরমে ওঠে ট্রায়ালের একদিন পর, রাতে শোয়ার সময়ে, হাহাকার আর অভিযোগ থামতে চায় না স্ত্রীর। নির্বাচনে প্রাণপাত করেছেন কর্ণেল, তবু কোনো পদ পায়নি; গৃহযুদ্ধে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন তবু পেনশন মেলেনি; সরারই ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত, শুধু তাঁদেরই না খেয়ে মরবার অবস্থা। মোরগটাকে বিক্রি করে দেওয়া ছাড়া আর - কিছু করার নেই এখন, জোর দিয়ে বলেন তিনি।

অবসন্ন কর্নলের চোখে ঘুম নেমে আসে একসময়, তিনি পড়ে যান দেশকালহীন কোনো পদার্থ (Substance)-এর তলদেশে, যেখানে তাঁর স্ত্রীর কথাগুলো ভিন্ন তাৎপর্য পেয়ে যায়। সেই 'ভিন্ন তৎপর্য' কী তা বলা নেই উপন্যাসে, হয়তো পাঠককেই বুঝে নিয়ে হবে সেটা পরিশেষের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। এ-প্রসঙ্গে বলা যায়, কালহীন দেশহীন কোনো অবস্থানের কল্পনায় অস্বীকৃত হয় না অস্তিত্ব আর পরিপ্রেক্ষিতের দ্বন্দ্ব। প্রতিকূলতাবিহীন অস্তিত্ব অকল্পনীয় এবং দেশ-কালে নানাভাবে মূর্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েই ঘুরে চলে জীবন।

ভোর হয়ে আসছে যখন, তখন আবার শুরু হয় তাঁদের কথা-কাটাকাটি। কর্নেলের মতে, মোরগ - লড়াই হবে ২০ জানুয়ারি, তারপর অর্থ পাওয়া যাবে, কেননা এটা এমন একটা মোরগ যে হারতে পারে না। 'ধরো ও হেরে গেল' বলেন তাঁর স্ত্রী। 'সে ভাবনা শুরু করার জন্য এখনও চুয়াল্লিশ দিন বাকি আছে,' উত্তরে বলেন কর্নেল। ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন ভদ্রমহিলা। 'এর মধ্যে আমরা খাব কী?' তিনি জিজ্ঞাসা করেন আর স্বামীর কলার ধরে জোরে ঝাঁকুনি দেন।

এই মুহূর্তটিতে পৌঁছতে পঁচাত্তর বছর — তাঁর জীবনের পুরোপুরি পঁচাত্তরটা বছর — লেগেছে কর্নেলের। ''নিজেকে বিশুদ্ধ, স্পষ্ট, অজেয় লাগে তাঁর যখন তিনি উত্তরে বলেন : 'শিট'।" লক্ষ করতে হবে, 'শিট' শব্দটার পরে পূর্ণচ্ছেদ আচে, বিস্ময়সূচক চিহ্ন নয়। সুতরাং এটা ইংরেজিতে যাকে বলে 'swear word' তা নয়, সুতরাং ব্যঞ্জনা আরোপ না করলে এর অর্থ হতে পারে 'বাহ্যে' মা 'মল'। অর্থ যাই হোক, এই উচ্চারণে উন্মোচিত হয়ে যান কর্নেল, নিজেকে পুরোপুরি খুলে দেখান তিনি, আর তখন বোঝা যায় সমস্ত বিরূপতা আর পরাভরের মাঝখানে কী হতে পারে মানবীয় উপাদানের সার। এইখানেই উপন্যাসটি পৌঁছে যায় এক মহনীয়তায়।

এরপর আর সম্ভব ছিল না কর্নেলের গল্পকে টেনে নিয়ে যাওয়া।

আট

একজন লেখক, গার্সিয়া মার্কেসের বিশ্বাস, বই লেখেন একটাই, সেই বইয়ের নানা খন্ডের প্রকাশ হয় ভিন্ন ভিন্ন নামে। তাঁর সেই একটি বই হবে দা বুক অব সলিটিউড' (নিঃসঙ্গতার বই), জানিয়েছেন তিনি একটি সাক্ষাৎকারে ('ফ্রেগ্রান্স অব দা গোয়াভা')। 'নো ওয়ান রাইট্স টু দা কর্নেল' তাঁর সেই বইয়ের একটি খন্ড, যেখানে ধরা আছে এক কর্নেলের 'সলিটিউড', রাজনীতিক - সামাজিক বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে।

এ-উপন্যাসে কথা পরিমাণে কম, কিন্তু অর্থবহ এবং অব্যর্থ; এর গঠন যুক্তিশাসিত। এসব নিজেই বলেছেন লেখক ওই সাক্ষাৎকারে। শুধু এইটে যোগ করবার যে, কোথাও কোথাও ইঙ্গিত বা অনুক্ত অংশ কথা দিয়ে জুড়ে নিতে হয় পাঠককেই, কেননা সেসব ক্ষেত্রে বাস্তব জেগে ওঠে রহস্যময়তা নিয়ে। মার্কেসের বলা 'reality represented through a secret code' কথাটা ('ফ্রেগ্রান্স অব দা গোয়াভা') মনে আসে এ প্রসঙ্গে।

(বলা দরকার, এ লেখা তৈরি হয়েছে উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদের ভিত্তিতে। আর - একটা কথা। নিঃসঙ্গ কর্নেল শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছোন, শুধু সেইটে বুঝবার চেষ্টা আছে এখানে, আর কিছু নয়।)